গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ৩২ সংখ্যা | ২৯ মার্চ - ৪ এপ্রিল ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

গত একশো বছরে এমন বৈষম্য দেখেনি মানুষ

নতুন রিপোর্টে ফেঁসে গেল ‘বিকশিত ভারত’-এর ফানুস

প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সহযোগীরা যখন সাত ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির ধুয়া তুলে এ বারের ভোটটা পার করে দেওয়ার খোয়াব দেখছেন ঠিক সেই সময়ে ‘ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি ল্যাব’-এর একটি ভয়ঙ্কর রিপোর্ট তিরের মতো এসে ফুটো করে দিয়েছে প্রচারের সেই ঢাউস ফানুস।

প্যারিসের খ্যাতনামা এই সংস্থা, টমাস পিকেটির মতো বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ যার সঙ্গে যুক্ত, তার এই রিপোর্ট দেখাচ্ছে, গত একশো বছরের মধ্যে নরেন্দ্র মোদির শাসনকালেই দেশের আর্থিক বৈষম্য সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। ভারতের মোট আয়ের ২২.৬ শতাংশ এবং মোট সম্পদের ৪০ শতাংশেরও বেশি জমা হয়েছে সবচেয়ে ধনী ১ শতাংশ মানুষের হাতে। আর দরিদ্রতম ৫০ শতাংশ মানুষের কাছে পড়ে আছে দেশের মোট আয়ের মাত্র ১৫ শতাংশ। এই ১ শতাংশের বাৎসরিক আয় গড়ে ৫৩ লক্ষ টাকা, যা বাকি ৯৯ শতাংশ ভারতবাসীর গড় আয়ের ২৩ গুণ। অবশ্য এতেও পুরোটা বোঝা যায় না। এই ১ শতাংশের মধ্যে প্রথম কয়েকজনের আয় আবার ঘন্টায় কয়েকশো কোটি টাকা। রিপোর্টটি আরও দেখিয়েছে, গত শতকের ৮০-র দশকের পর থেকে বৈষম্য ক্রমাগত বাড়তে শুরু করেছিল ভারতে। ধীরে ধীরে সেই বৃদ্ধির হার দ্রুততর হচ্ছিল। অবশেষে ২০১৪-১৫ থেকে ২০২২-২৩-এর মধ্যে, অর্থাৎ কেন্দ্রে বিজেপি সরকারে আসার পর থেকে ধনী-গরিবে

দুয়ের পাতায় দেখুন

ভারতে আয় বৈষম্য (২০২২-’২৩)

অর্থনৈতিক বিভাগ	মোট কর্মক্ষম মানুষ	গড় বার্ষিক আয় (টাকা)	মাসিক আয় (টাকা)	দৈনিক আয় (টাকা)
নীচের ৫০ শতাংশ	৪৬.১ কোটি	৭১.১৬৩	৫,৯৩০	১৯৭
মাঝের ৪০ শতাংশ	৩৬.৯ কোটি	১,৬৫,২৭২	১৩.৭৭২	৪৬০
শীর্ষের ০.০০১ শতাংশ	৯,২২৩ জন	৪৮,৫১,৯৬,৮৭৫	৪,০৪,৩৩,০৭৩	

গরিব ঃ ৪৬.১ কোটি, মধ্যবিত্ত ঃ ৪৬.৯ কোটি, ধনী ঃ ৯.২ কোটি

দেশে সম্পদে বৈষম্য

অর্থনৈতিক বিভাগ	সম্পদের অংশ	গড় সম্পদ টাকায়	মন্তব্য
নীচের ৫০ শতাংশ,	৬.৪	১,৭৩,১৮৪	২ লক্ষ টাকার কম
উপরের ১০ শতাংশ	৬৫.০	৮৭,৭০,১৩২	১০-৮৮ লক্ষের মধ্যে
শীর্ষের ০.০০১ শতাংশ	১৬.৮	২২,৬১,৩৩,৫৪,৯২৮	৩০০-২২৬১ কোটির মধ্যে

- শীর্ষের ৯২২৩ জনের গড় সম্পদ ঃ ৩০০ থেকে ২২৬১ কোটির মধ্যে
- নিচের ৪৬.১ কোটি মানুষের গড় সম্পদ ঃ ২ লক্ষ টাকার কম
- শীর্ষের ৯২২৩ জনের গড় মাসিক আয় ঃ ৪ কোটি ৪ লাখের বেশি
- নিচের ৪৬.১ কোটির গড় মাসিক আয় ঃ ৫ হাজার ৯৩০ টাকা

গার্ডেনরিচে বেআইনি বহুতল ভেঙে মৃত ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ এবং অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে মিছিল ও ১৫ নং বরোতে বিক্ষোভ। ২৩ মার্চ

(খবর সাতের পাতায়)

নির্বাচনী বন্ড ঃ ভোটসর্বস্ব দল ও পুঁজিপতিদের আঁতাত প্রকাশ্যে

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) মার্ক্সবাদের শিক্ষাকে তুলে ধরে একটা কথা প্রথম থেকেই বলে আসছে যে, বর্তমান রাষ্ট্রটি একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং তা চলছে সম্পূর্ণরূপে পুঁজিপতি শ্রেণিরই স্বার্থে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের আইন, রীতিনীতি, পদক্ষেপ সবই তৈরি হয় পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থকে লক্ষ রেখে। কিন্তু এই সত্যটা যাতে সাধারণ মানুষ ধরতে না পারে তার জন্য বাইরে তারা একটি গণতান্ত্রিক ধাঁচা বজায় রাখে, এই স্বার্থরক্ষার কাজটা তারা পর্দার আড়ালে সারে। নির্বাচনী বন্ড কেলেঙ্কারি সেই পর্দাটাকেই যেন এক টানে সরিয়ে দিয়ে গোপন যোগসাজশটাকে একেবারে বেআব্রু করে দিল।

রাষ্ট্রব্যবস্থাটিকে সামনে রেখে পুঁজিপতিদের শ্রেণি-স্বার্থ দেখার কাজটি করে ক্ষমতাসীন দল তথা তার সাংসদ-মন্ত্রীরা। বিনিময়ে সংসদীয় দলগুলির এবং তাদের সাংসদ-নেতা-মন্ত্রীদের পকেট ভরে দেয় পুঁজিপতিরা। সংসদীয় দলগুলি প্রায় প্রত্যেকটিই মুখে নিজেদের জনগণের সেবক বললেও, আসলে এই দলগুলি পুঁজিপতি শ্রেণিরই স্বার্থে কাজ করে। তাই দলের খরচ, ভোটের খরচ, নেতা-সাংসদ-মন্ত্রীদের বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য তারা পুঁজিপতিদেরই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। পুঁজিপতিরাও খুশি মনে তাদের টাকা দেয়। আর এই টাকার বিনিময়ে পুঁজিপতিরা নিজেদের অনুকূলে একের পর এক আইন তৈরি করিয়ে নেয়, যা দেশের মানুষ দেখেছে তিনটি কৃষি আইনের ক্ষেত্রে কিংবা শ্রমিকদের থেকে সমস্ত অধিকার-সুযোগসুবিধা কেড়ে নেওয়া নতুন শ্রমকোড তৈরির ক্ষেত্রে। আবার ব্যক্তিগত ভাবে পুঁজিপতিরা এই সব মন্ত্রী-সাংসদদের কাজে লাগিয়ে অন্য পুঁজিপতিদের তুলনায় কিছু

তিনের পাতায় দেখুন

মানবসম্পদের উন্নয়নে পেছনের দিকে এগোচ্ছে মোদির ভারত

যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন সংক্রান্ত সমীক্ষার সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সের তালিকায় ভারতবর্ষের স্থান ১৩৪ নম্বরে।

আর্থিক বৈষম্য, দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান, দারিদ্র-বেকারি ইত্যাদির ভিত্তিতে দেশগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করে যে তালিকা করা হয়েছে, সেখানে চিন এবং শ্রীলঙ্কার স্থান যথাক্রমে ৭৫ এবং ৭৮-এ। এমনকি প্রতিবেশী ভুটান আর বাংলাদেশও ভারতের থেকে কিছুটা এগিয়ে ১২৫ আর ১২৯-এ বসেছে। কাজেই, নির্বাচনের আগে বিজেপি-র নেতামন্ত্রীরা যতই বিকশিত ভারতের কথা বলুন, মন্দির-মসজিদের কাজিয়ায় মানুষকে রুজিরুটির সমস্যা ভুলিয়ে রাখতে চান আর গদি দখলের জন্য ২০১৪ আর ২০১৯-এর মতোই মিথ্যে প্রতিশ্রুতির ঝুলি খুলে বসুন, এই রিপোর্ট আবারও দুইয়ে দুইয়ে চারের মতো পরিষ্কার দেখিয়ে দিচ্ছে, ক্ষমতার দশ বছরে দেশের কেমন ‘উন্নয়ন’ তাঁরা করেছেন।

করোনা অতিমারির ধাক্কা কাটিয়ে বিশ্বের নানা দেশের অর্থনীতি কতটা ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছে, বিভিন্ন সরকারি নীতির সুফল মানুষ কতটা ভোগ করছেন, এ সব খতিয়ে দেখতে করা হয়েছিল সমীক্ষাটি। দেখা গেছে, দেশে দেশে ধনী-গরিবের বৈষম্য যেমন কমার পরিবর্তে বেড়েই চলেছে, তেমনই ধনী দেশ আর গরিব দেশগুলোর মধ্যে আর্থিক ব্যবধানও ক্রমশ বাড়ছে। সারা বিশ্বের মোট বাণিজ্য-সম্পদের ৪০ শতাংশ জমা হচ্ছে মাত্র দু-

ছয়ের পাতায় দেখুন

কাশ্মীর নাকি ‘শিকলমুক্ত’!

প্রধানমন্ত্রীর সভা ভরাতে সরকারি কর্মীদের উপর জবরদস্তি

গত ৭ মার্চ কাশ্মীরে সভা করলেন প্রধানমন্ত্রী। ২০১৯ সালে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা তথা ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির পর এই প্রথমবার সেখানে পা রাখলেন নরেন্দ্র মোদি। শ্রীনগরে বক্সি স্টেডিয়ামের সেই সভায় যোগ দিতে সেদিন কয়েক হাজার সরকারি কর্মচারী ও সরকারি দফতরে কর্মরত দিনমজুরকে প্রবল ঠাণ্ডায় রাতের অন্ধকারে ঘর থেকে বের করে আনা হয়েছিল।

সামনেই লোকসভা ভোট। তাই সভায় প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৩৭০ ধারা তুলে দিয়ে কাশ্মীরকে দুর্দশার অতল খাদ থেকে স্বর্গের কোন উচ্চতায় তুলে নিয়ে গেছে বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার, গলা ফাটিয়ে তার খতিয়ান দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। বলেছেন, হাল ফিরে গেছে কাশ্মীরের। বিজেপি আমলে তৈরি হয়েছে ‘নতুন কাশ্মীর’। কাশ্মীর এখন শিকলমুক্ত। এরই জন্য নাকি মানুষ দশকের পর দশক অপেক্ষা করেছেন। উপস্থিত কাশ্মীরবাসীদের ধন্যবাদও জানিয়েছেন তিনি সমাবেশে আসার জন্য।

তা, মোদিজির এই ‘নতুন কাশ্মীর’ কতখানি নতুন? উপত্যকার প্রান্ত-প্রত্যন্ত থেকে মিলিটারির বুটের শব্দ মিলিয়ে গেছে কি? রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের কবল থেকে বেরিয়ে প্রাণভরে শ্বাস নিতে পারছেন নাকি ভূস্বর্গের নাগরিকরা? স্বাধীন ভাবে মতপ্রকাশ সহ গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি ভোগ করতে পারছেন তাঁরা? অর্থনীতির উন্নতি হয়েছে? সে দিন সমবেত হয়েছিলেন যে হাজার হাজার মানুষ, তাঁরাই বা কারা? কাশ্মীরের নতুন চেহারায় তৃপ্ত হয়ে মোদিজির সভায় তাঁকে ধন্যবাদ জানাতেই তাঁরা এসেছিলেন নাকি?

দুঃখের হলেও সত্য, এই সব ক’টি প্রশ্নেরই উত্তর না-বাচক। ৩৭০ ধারা তুলে নেওয়ার পাঁচ বছর পার হতে চলল, রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের ফাঁসে আজও শ্বাসরুদ্ধ কেন্দ্রশাসিত কাশ্মীর। বিজেপির নেতা-মন্ত্রীদের বহু প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ২০১৪ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত সেখানে কোনও নির্বাচন হয়নি। জোটেনি স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা। আজও সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে প্রাণ হারাচ্ছেন বহু নিরীহ মানুষ। সরকারের সামান্যতম বিরোধিতা করলে, কিংবা রাজ্যের মানুষের প্রকৃত পরিস্থিতি সংবাদমাধ্যমে তুলে আনলে গণতন্ত্রের সমস্ত রীতিনীতি দু-পায়ে দলে গ্রেফতার করা চলছে সাধারণ মানুষকে, বিশেষ করে সাংবাদিকদের। বিরোধী দলের অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। সর্বত্র বিরাজমান বেয়নেট উঁচানো মিলিটারির বুটের তলায় আজও পিষ্ট হচ্ছে কাশ্মীরের জনজীবন।

তা যদি না হত, প্রধানমন্ত্রীর কথা অনুযায়ী যদি কাশ্মীরে সুস্থিতি কায়েম হয়ে থাকত, তাহলে তাঁর সফর উপলক্ষে শ্রীনগর শহরটিকে দুর্গে পরিণত করতে হত কি? শুধু বক্সি স্টেডিয়ামের আশপাশের এলাকাই নয়, শ্রীনগরের বিরাট অংশ জুড়ে অনুমতি ছাড়া যানবাহন চলাচল সেদিন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ৭ মার্চেই শুরু হওয়ার কথা ছিল কাশ্মীরের দশম শ্রেণির বোর্ডের পরীক্ষা। নরেন্দ্র মোদির সভার কারণে সেই পরীক্ষা পর্যন্ত স্থগিত করে দেওয়া হয়। সফর উপলক্ষে গোটা কাশ্মীর উপত্যকা জুড়ে, বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিক ও সংখ্যালঘুদের মহল্লাগুলিতে নিরাপত্তার বহর প্রবল ভাবে বাড়িয়ে তোলা হয়েছিল। ঠিক এক মাস আগে ৭ ফেব্রুয়ারি শ্রীনগরের শহিদগঞ্জ এলাকায় সন্ত্রাসবাদীদের হাতে খুন হয়েছেন দুই পরিযায়ী শ্রমিক। ফলে সতর্কতার অন্ত ছিল না পুলিশ-প্রশাসনের। যে কাশ্মীরী পণ্ডিতদের উপর সন্ত্রাসবাদী হানা নিয়ে এত সাম্প্রদায়িক প্রচার চালায় বিজেপি, সেই পণ্ডিতদের সংগঠন ‘কাশ্মীরী পণ্ডিত সংঘর্ষ সমিতি’-র সভাপতি সঞ্জয় টিক্কুও নিরাপত্তা ব্যবস্থার বাড়াবাড়িতে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে তাঁদের অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে, বাইরে বেশি চলাফেরা করতে নিষেধ করা হয়েছে। টিক্কু মন্তব্য করেছেন, এ সব থেকেই তো পরিষ্কার যে কাশ্মীর এখন কতখানি স্বাভাবিক! শ্রীনগরেরই এক ব্যবসায়ী বলেছেন, “প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে যদি এই মাপের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হয়, তাহলে বলতে হয় ৩৭০ ধারা বিলোপের ফলে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ দূর হয়ে গেছে বলে বিজেপির সমস্ত দাবি হয় অযৌক্তিক, না হয় এ সব করা হয়েছে সাধারণ মানুষের হয়রানি বাড়ানোর জন্য।” তিনি আরও বলেছেন, “প্রধানমন্ত্রী যদি সত্যিই কাশ্মীরের মানুষের প্রতি মানবিকতা দেখাতে চান, তাহলে কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদাদান এবং নির্বাচন পরিচালনার মাধ্যমে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করুন।”

বাস্তবে এই হল কাশ্মীরের জনসাধারণের মনের কথা। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দলের কর্মকর্তাদেরও এ কথা অজানা নয়। তাই পাছে সভা ফ্লপ করে, তাই সমস্ত সরকারি দফতরে হুকুম জারি করে কমপক্ষে ৭ হাজার সরকারি কর্মচারীকে সেদিন সভায় উপস্থিত হতে বলা হয়েছিল। সরকারি দপ্তরগুলিতে কর্মরত কয়েকশো ঠিকা-কর্মীকেও সভায় হাজির হওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন প্রশাসনের বড়কর্তারা। লিখিত নির্দেশ ছিল না। কিন্তু কর্মীরা জানিয়েছেন, বড়কর্তাদের ভাবেভঙ্গিতে স্পষ্ট ছিল, সভায় উপস্থিত না থাকলে ফল ভালো হবে না। ফলে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও দূর দূরান্ত থেকে ভোরের আলো ফোটার আগেই প্রবল ঠাণ্ডায় বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল সরকারি কর্মী ও ঠিকা শ্রমিকদের।

ফলে প্রধানমন্ত্রীর অনুগত সেনাবাহিনী কিংবা প্রশাসনের বড়কর্তারা যতই বলুন, নরেন্দ্র মোদির প্রথম প্রকাশ্য সভায় কাশ্মীরের মানুষ সেদিন প্রধানমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা কিংবা ভালোবাসা থেকে আসেননি। তাঁরা এসেছিলেন ওপরওয়ালাদের চাপে বাধ্য হয়ে। কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের এই ক্ষোভের কথা খুব ভালো করেই জানা আছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের। তাই বোধহয় সেখানে বিধানসভা নির্বাচন করতে এত গড়িমসি তাদের।

একশো বছরে এমন বৈষম্য দেখেনি মানুষ

একের পাতার পর

আর্থিক বৈষম্য চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে।

ভারতের মতো একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে অর্থব্যবস্থার নিজস্ব নিয়মেই ধনী-গরিবে আর্থিক বৈষম্য থাকার কথা। ফলে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পরেও স্বাধীন ভারতে আর্থিক বৈষম্য ঘোচেনি। কিন্তু পৃথিবীর বড় একটি অংশে যতদিন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অস্তিত্ব ছিল, মানুষের মধ্যে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আকাঙ্খা প্রশমিত করে রাখতে ভারতের সরকারগুলি সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলিকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য হত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিয়মে শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা লুটে নিজেদের ভাণ্ডার ভরালেও সেই সময় নানা সরকারি বিধিনিষেধের কারণে পুঁজিমালিকরা শ্রমজীবী মানুষকে কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে খানিকটা বাধ্য হত।

’৯০-এর দশকের গোড়ায় সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর থেকে একমেরু পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বে পুঁজির শোষণ লাগামছাড়া হতে শুরু করে। ভারতেও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পুঁজিপতিদের শোষণের মাত্রা তীব্রতর হয়ে উঠতে শুরু করে। পাশাপাশি ক্রমাগত কমতে থাকে সমাজকল্যাণে বাজেট-বরাদ্দ। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর বাড়তে থাকে পুঁজিমালিকদের দখলদারি। কার্যত সরকারগুলির একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায় বৃহৎ পুঁজির মালিকদের মুনাফা-লুটের ব্যবস্থা করে দেওয়া। কংগ্রেসের পথ ধরে হেঁটে সেই কাজে বর্তমান বিজেপি সরকার আরও কয়েক ধাপ এগিয়েছে। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে গোটা দেশের প্রায় সমস্ত সম্পদ হাতের মুঠোয় পুরেছে আদানি-আম্বানিদের মতো হাতে-গোনা কয়েকজন বৃহৎ পুঁজিপতি।

তাই ক্রমাগত নিঃস্ব, সর্বস্বহারা হয়ে চলেছেন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষ। মানুষে মানুষে আর্থিক বৈষম্য ক্রমশ আরও বীভৎস রূপ নিচ্ছে। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় পুঁজিমালিকের মুনাফার দৌলতে টাকার অঙ্কে ভারতীয় অর্থনীতি যত ট্রিলিয়ন ডলারেই পৌঁছক, দেশের খেটে-খাওয়া বেশিরভাগ মানুষকে সেই বিপুল সম্পদের সুফল থেকে বঞ্চিত হয়েই জীবন কাটাতে হবে। দু’বেলা দু’মুঠো খাবার জোগাড় করাই তাদের কাছে আরও কঠিন হতে থাকবে। অশিক্ষায় ডুবে থাকা আর বিনা চিকিৎসায় ধুঁকতে থাকাই হবে তাদের ভবিতব্য। একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শোষণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিণতি এমনই। সেই সত্যই উঠে এসেছে ‘ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি ল্যাব’-এর সাম্প্রতিক এই রিপোর্টে।

জীবনাবসান

কলকাতায় দলের বেহালা পশ্চিম আঞ্চলিক কমিটির প্রবীণ পার্টি সদস্য কমরেড শ্যামসুন্দর মাইতি দীর্ঘ রোগ ভোগের পর ১৫ মার্চ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

কমরেড শ্যামসুন্দর মাইতি তাঁর পুত্র তাপস মাইতির মাধ্যমে ১৯৯১ সালে দলের সাথে যুক্ত হন। ’৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির মদতে গোটা দেশে যখন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তখন বেহালা পশ্চিম লোকালের উদ্যোগে গড়ে ওঠে ‘সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা কমিটি’। কমরেড শ্যামসুন্দর মাইতি এই কমিটিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন এবং অচিরেই তিনি দলের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্বক্ষণের কর্মীতে পরিণত হন। নিজের স্ত্রী, কন্যা এবং পুত্রবধূকেও তিনি দলের সাথে যুক্ত করেন। জীবিকার জন্য ঘুরে ঘুরে ফুল বিক্রি করার শ্রমসাধ্য কাজ সত্ত্বেও দলের কাজে তাঁর উদ্যোগের খামতি থাকত না। প্রবীন বয়সেও তিনি সত্তর কপি গণদাবী বিক্রি করতেন এবং যে কোনও দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসতেন।

ছোটবেলা থেকে প্রবল দারিদ্রের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে উঠা শ্যামসুন্দর মাইতি প্রথাগত পড়াশোনার বিশেষ সুযোগ না পেলেও পার্টির মুখপত্র ও পত্রপত্রিকা পড়ায় তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল। অত্যন্ত মৃদুভাষী এবং মার্জিত রুচিসম্পন্ন হওয়ায় তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সেই সময় দলের বেহালা পশ্চিম ইউনিটে একঝাঁক তরুণ কর্মী যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁদের অত্যন্ত প্রিয় ‘মেসোমশাই’ হয়ে উঠেছিলেন। ২০০১ সালে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং বেশ কয়েকবার তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়। এই অবস্থায় ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করা যখন তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না, তিনি দলের অফিস সংক্রান্ত নানা কাজ অত্যন্ত দায়িত্বের সাথে পালন করতেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বই পালন করে গেছেন। এ দিন তাঁর মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান দলের কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তপন চক্রবর্তী, কমরেড মৃত্যুঞ্জয় রায় ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বিজন হাজরা। ফ্রন্ট ও পার্টির স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সহ উপস্থিত সকলে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড শ্যামসুন্দর মাইতি লাল সেলাম

ভ্রম সংশোধন ঃ গত সংখ্যায় ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে দলের প্রার্থীর নাম ভুল ছাপা হয়েছে। সঠিক নাম দীনেশ মেইকাপ। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

পুঁজিপতিদের আঁতাত প্রকাশ্যে

একের পাতার পর

বাড়তি সুবিধা আদায় করে নেয়। যেমন দেখা গেল, অন্য পুঁজিপতিদের টেক্কা দিয়ে আদানি গোষ্ঠী দেশের বেশির ভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি হাতিয়ে নিয়েছে। সবটাই হয়েছে গোপন লেনদেনের মাধ্যমে, যে লেনদেনের এক ভগ্নাংশ মাত্রই নির্বাচনী বন্ড দুর্নীতির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ্যে এল। এমন হাজারটা ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে জনগণের স্বার্থকে বলি দিয়ে এ ভাবে পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থকে রক্ষা করা হয়েছে। বন্ড দুর্নীতিতে কর্পোরেট কোম্পানিগুলির নাম যে ভাবে বন্ড কেনার তালিকায় প্রকাশ পেয়েছে তাতে এই যোগসাজশটাই প্রকাশ্যে এসেছে।

নরেন্দ্র মোদিরা ক্ষমতায় বসে পুঁজিপতিদের সঙ্গে এই যোগসাজশটিকে জনগণের দৃষ্টি থেকে আড়াল করতে নির্বাচনী বন্ড নাম দিয়ে তাকে একটা আইনি মুখোশ পরায়। সেই সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, নির্বাচন কমিশন সহ নানা মহলের প্রবল আপত্তিকে কার্যত গায়ের জোরে উড়িয়ে দেন নরেন্দ্র মোদিরা। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট সেই গোটা প্রক্রিয়াটিকেই বেআইনি তথা সংবিধান বিরোধী বলে বাতিল করেছে। নির্দেশ দিয়েছে, এই বন্ডে কারা কারা টাকা ঢেলেছে এবং কোন কোন দল সেই টাকা পেয়েছে তার সমস্ত তথ্য স্টেট ব্যাঙ্ককে জানাতে হবে। বিজেপির পাশাপাশি এই নির্দেশের বিরোধিতা করে দেশের পুঁজিপতিদের তিনটি প্রধান বণিকসভা সিআইআই, ফিকি, অ্যাসোচেম। তাঁদের আইনজীবী বলেন, কারা চাঁদা দিয়েছেন তা গোপন রাখাটা জরুরি।

কেন জরুরি? আসলে তা না হলে এই পুঁজিপতি-শাসকদল যোগসাজশটা প্রকাশ্যে এসে যায় এবং জনসাধারণও সংসদীয় দলগুলির জনস্বার্থবিরোধী প্রতারক চরিত্র খানিকটা ধরতে পারে। যাদের তারা নিজেদের স্বার্থরক্ষাকারী দল মনে করে সমর্থন করে, ভোট দেয়, সেই দলগুলির জনস্বার্থবিরোধী প্রতারক চরিত্রও প্রকাশ্যে এসে যায়। এক কথায় সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তথা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার মুখোশটাই খুলে যায়। 'জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন'— কথাটিও যে আজ নেহাত মিথ্যাচারে পরিণত হয়েছে, প্রকাশ্যে এসে যায় তা-ও। ভোটবাজ দলগুলি ভোট এলে প্রকাশ্যে যে হাজার হাজার কোটি টাকা ছড়ায়, তার উৎস যে পুঁজিপতি শ্রেণি, তা সামনে আসার সাথে সাথে এটাও প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, পুঁজিপতি শ্রেণির টাকায় ভোট করে যে দলগুলি, তারা পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থই রক্ষা করবে, জনগণের স্বার্থ নয়। সঙ্গে সঙ্গে এটাও পরিষ্কার হয়ে পড়ে যে, স্বাধীনতার আট দশক হতে চললেও কেন আজও সাধারণ মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি মিটল না, অথচ ভারতীয় পুঁজিপতিরা সম্পদের নিরিখে বিশ্বের প্রথম সারিতে, এমনকি কেউ কেউ দ্বিতীয় ধনীতে পরিণত হয়ে যেতে পারল! আর এ সব গোপনীয় বিষয় ফাঁস হয়ে গেলে গণতন্ত্রের মূল কথা— সকলের সমান অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীন অধিকার ইত্যাদি কথাগুলিরও আর কোনও মূল্য থাকে না।

পুঁজিপতি শ্রেণি, তাদের পরিচালিত সংবাদমাধ্যম এবং তাদের অনুগৃহীত বিশেষজ্ঞরা নির্বাচনকে জনগণের একটি পবিত্র অধিকার হিসাবে প্রচার করে। বাস্তবে পবিত্রতা দূরের কথা, তাতে যে কত কালি মাখানো, নির্বাচনী বন্ড-কাণ্ড তা স্পষ্ট করে দিয়ে গেল। নির্বাচনী বন্ডের সিংহভাগ বিজেপির থলিতে গেলেও, বাকি দলগুলি প্রায় সবাই কমবেশি এই বন্ড থেকে লাভবান হয়েছে। সেই টাকা সব দলই জনমতকে প্রভাবিত করতে কাজে লাগিয়েছে। অর্থাৎ এই দলগুলি জনগণের কল্যাণে তথা স্বার্থে করা কাজের দ্বারা জনমতকে জয় করার পরিবর্তে টাকা ছড়িয়ে যে সমর্থন কেনার চেষ্টা করে চলেছে, তা আজ স্পষ্ট। এই টাকা খরচ করে দলগুলি যেমন সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার চালায়, তেমনই অসচেতন মানুষকে নগদ টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়ে তাদের ভোট কিনে নেয়। আবার কোনও দল এই টাকা খরচ করে ক্লাবের যুবকদের দলের অনুগত করে পাড়ার ভোটারদের নিয়ন্ত্রণে আনে, ঠিক যেমন নির্বাচনে সন্ত্রাস তৈরি করতে এই টাকার একটা অংশ তারা সমাজবিরোধীদের পিছনে খরচ করে। আবার এই টাকা খরচ করেই তারা কেউ স্মার্ট ফোন তো কেউ ট্যাব কিংবা টিভি উপহার দেয় ভোটারদের। অর্থাৎ চলতি নির্বাচন নামক 'পবিত্র' ব্যবস্থাটির দ্বারা বাস্তবে জনমতের সত্যিকারের প্রতিফলন ঘটে না। গোটা প্রশাসনিক ব্যবস্থাটা নিরপেক্ষতার মুখোশ পরে অর্থবান শ্রেণির পক্ষেই কাজ করে। ফলে পুঁজিপতি শ্রেণি যাদের চায় তাদের দিকে প্রশাসন-পুলিশ চক্র পুরোপুরি হেলে পড়ে। হাওয়া বুঝে সমাজবিরোধীরাও তাদের পাশেই দাঁড়ায়।

তা ছাড়া এই বিপুল পরিমাণ টাকা পুঁজিপতিদের থেকে যারা নিচ্ছে আর যারা নিচ্ছে না— খরচের জন্য জনগণের সহায়তার উপর নির্ভর করছে, উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষমতা কখনওই সমান হয় না। সৎ, জনস্বার্থে লড়াকু সৈনিকও প্রতিপক্ষের প্রচারের বানে ভেসে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যায়। ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগও অসম হয়ে যায়, যা গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্তকেই লঙ্ঘন করে। প্রচারের জৌলুসকেই শক্তি ভেবে জনগণ প্রতারিত হয়। সে জন্য দেখা যায় জনগণের বিপুল ক্ষোভ যে দলের বিরুদ্ধে তারাও নানা উপায়ে ভোট ম্যানেজ করে জিতে যায়। নির্বাচনের নামে এই জিনিসই চলে আসছে স্বাধীনতার পর থেকে। এ কথা আজ দেশের মানুষকে স্পষ্ট করে বুঝতে হবে যে, এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পুঁজিপতি শ্রেণিরই বিশ্বস্ত একটি দলের পরিবর্তে আর একটি বিশ্বস্ত দল নির্বাচিত হয়— যারা শাসক শ্রেণির স্বার্থেই কাজ করে। তাই এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটিকে অটুট রেখে শুধু সরকার বদলে জনগণের স্বার্থ রক্ষা হয় না। জনগণের স্বার্থ রক্ষা হতে পারে একমাত্র প্রবল গণআন্দোলনের আঘাতে এই ব্যবস্থাটিকে বদলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করার দ্বারাই।

৪৮৭টি কোম্পানির থেকে বিজেপি নিয়েছে ৬০৬০ কোটি টাকা

এই বিজেপি কি জনগণের স্বার্থ দেখতে পারে

সংসদীয় দলগুলি প্রায় সবাই বন্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্পসংস্থা থেকে কেউ শত কোটি, কেউ সহস্র কোটি টাকা নিয়েছে। তার মধ্যে প্রায় অর্ধেকই নিয়েছে বিজেপি। দ্বিতীয় স্থানে রাজ্যের শাসক তৃণমূল। তারপরে কংগ্রেস। ২০১৯ থেকে '২৪ পর্যন্ত বন্ডের মাধ্যমে নেওয়া টাকার যে হিসাব পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, বেশির ভাগ শিল্পসংস্থাই বড় দলগুলির প্রায় সবাইকে টাকা দিয়েছে— কাউকে বেশি, কাউকে কম। এই হিসেবে ১২,৭৬৯ কোটি টাকা চাঁদার প্রায় অর্ধেক, ৬০৬০ কোটি চাঁদা পেয়েছে বিজেপি। ১৬১০ কোটি পেয়েছে তৃণমূল, কংগ্রেস পেয়েছে ১৪২২ কোটি। অর্থাৎ যারা কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় রয়েছে তারা বেশি পেয়েছে, অন্যরা কম। এ থেকে স্পষ্ট যারা ক্ষমতায় রয়েছে, পুঁজিপতিরা যেমন তাদের টাকা দেয়, তেমনই যারা সাইড লাইনে অপেক্ষা করছে, যে কোনও সময় ক্ষমতায় আসতে পারে, তাদেরও টাকা দেয়। যেমন লটারি ব্যবসার 'মুকুটহীন সম্রাট' স্যান্টিয়াগো মার্টিনের সংস্থা ফিউচার গেমিংয়ের কথাই ধরা যাক। এই সংস্থাটিই নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলিকে সবচেয়ে বেশি টাকা দিয়েছে (১৩৬৮ কোটি টাকা)। এরা তৃণমূলকে দিয়েছে সব চেয়ে বেশি— ৫৪২ কোটি টাকা। উল্লেখ্য এ রাজ্যে ফিউচারের গেমিংয়ের লটারির রমরমা ব্যবসা। ফিউচার বিজেপিকে দিয়েছে ১০০ কোটি টাকা, কংগ্রেসকে ৫০ কোটি টাকা, তামিলনাড়ুর দল ডিএমকে পেয়েছে ৫০৩ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক বড় মাপের প্রকল্প তৈরির কাজে যুক্ত হায়দরাবাদের সংস্থা মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিং রাজনৈতিক দলগুলিকে বন্ডে মোট ৯৮০ কোটি টাকা চাঁদা দিয়েছে। তার মধ্যে ৫৮৪ কোটি টাকা পেয়েছে বিজেপি। এদেরই শাখা সংস্থা ওয়েস্টার্ন ইউপি পাওয়ার দিয়েছে ৮০ কোটি টাকা। বিনিময়ে হাতিয়ে নিয়েছে বেশ কিছু বড় সরকারি প্রজেক্টের বরাত। বেদান্ত গোষ্ঠী বিজেপিকে দিয়েছে ২২৬.৬৫ কোটি, কংগ্রেসকে দিয়েছে ১০৪ কোটি টাকা।

এ বার আসা যাক এ রাজ্যে বিদ্যুতের একচেটিয়া ব্যবসা করা সিইএসসি তথা আরপিজি-সঞ্জীব গোয়েঙ্কা গোষ্ঠীতে। এদের নানা শাখা কোম্পানি রয়েছে। সবগুলি মিলিয়ে তৃণমূলকে দিয়েছে ৪৪৪ কোটি টাকা। এদের বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি হলদিয়া এনার্জি তৃণমূলকে দিয়েছে ২৮১ কোটি টাকা। এদের শাখা কোম্পানি ধারিওয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিয়েছে ৯০ কোটি, পিসিবিএল দিয়েছে ৪০ কোটি, ক্রিসেন্ট পাওয়ার দিয়েছে ৩৩ কোটি টাকা। এই টাকা দেওয়ার ফলটাও পশ্চিমবঙ্গবাসী জানেন। এর জন্য সারা দেশের মধ্যে এ রাজ্যেই বিদ্যুতের দাম সবচেয়ে বেশি। আবার কয়লার দাম অর্ধেক, এবং জিএসটি কমে ৫ শতাংশ হওয়ায় যেখানে বিদ্যুতের দাম অর্ধেক হতে পারে সেখানে দ্বিগুণ দাম জনগণের ঘাড় ভেঙে দিব্যি আদায় করে চলেছে সিইএসসি। আবার যেহেতু গোয়েঙ্কারা দেশ জুড়ে এবং বিদেশেও ব্যবসা করে তাই বিজেপিকেও তারা বঞ্চিত করেনি। হলদিয়া এনার্জি বিজেপিকে দিয়েছে ৮১ কোটি টাকা। আম্বানিদের রিলায়েন্স দিয়েছে একটু ঘুরপথে। টাকা দেওয়ার অঙ্কে তৃতীয় কুইক সাপ্লাই চেন নামে একটি সংস্থা যা রিলায়েন্সেরই খোলস সংস্থা বলে অভিযোগ উঠেছে, তারা বিজেপিকে দিয়েছে ৩৭৫ কোটি টাকা, শিবসেনাকে দিয়েছে ২৫ কোটি টাকা।

সবচেয়ে বেশি টাকা নিয়েছে যে ৩টি দল এবং সবচেয়ে বেশি টাকা দিয়েছে যে ১০টি সংস্থা, তার তালিকা

বিজেপি ঃ মোট ৬০৬০ কোটি টাকা

মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিং	৫৮৪	কোটি
কুইক সাপ্লাই চেন	৩৭৫	,,
বেদান্ত	২২৬	,,
ভারতী এয়ারটেল	১৯৭.৪	,,
মদনলাল লিমিটেড	১৭৫.৫	,,
ক্যাভেন্টার ফুড পার্ক	১৪৪.৫	,,
ডিএলএফ	১৩০	,,
বিড়লা কার্বন	১০৫	,,
ফিউচার গেমিং	১০০	,,
হলদিয়া এনার্জি	৮১	,,

তৃণমূল কংগ্রেস ঃ মোট ১৬১০ কোটি

ফিউচার গেমিং	৫৪২	কোটি
হলদিয়া এনার্জি	২৮১	,,
ধারিওয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার	৯০	,,
এমকেজে এন্টারপ্রাইস	৪৫.৯	,,
এভিস ট্রেডিং	৪৫.৫	,,
আইএফবি অ্যাগ্রো	৪২	,,
চেন্নাই গ্রিন উডস	৪০	,,
পিসিবিএল লিমিটেড	৪০	,,
প্রারম্ভ সিকিউরিটিজ	৩৮.৭৫	,,
ক্রিসেন্ট পাওয়ার	৩৩	,,

কংগ্রেস ঃ মোট ১৪২২ কোটি টাকা

ওয়েস্টার্ন ইউপি পাওয়ার	১১০	কোটি
বেদান্ত	১০৪	,,
এমকেজে এন্টারপ্রাইস	৯১.৬	,,
যশোদা সুপার স্পেশালিটি	৬৪	,,
এভিস ট্রেডিং	৫৩	,,
ফিউচার গেমিং	৫০	,,
শাসমল ইনফ্রাস্ট্রাকচার	৩৯	,,
ঋত্বিক প্রজেক্টস	৩০	,,
এসইপিসি পাওয়ার	৩০	,,
সিদ্ধি ট্রেডিং	২২	,,

সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২২ মার্চ ২০২৪

জেলায় জেলায় নির্বাচনী কর্মীসভা

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতি বাতিলের দাবিতে এবং বামপন্থার মর্যাদা রক্ষার্থে রাজ্যের ৪২টি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এস ইউ সি আই (সি)। দলের নির্বাচনী কর্মকাণ্ডকে সাজিয়ে নিতে রাজ্যের সমস্ত লোকসভা কেন্দ্রেই নির্বাচনী কর্মীসভা হচ্ছে।

পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ ১৯ মার্চ মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রে এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী কমরেড অনিন্দিতা জানার সমর্থনে দুই শতাধিক কর্মীকে নিয়ে নির্বাচনী কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয় নারায়ণগড় ব্লকের ডাঙরপাড়াতে। উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী নিজে এবং দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অনুরূপা দাস, পশ্চিম মেদিনীপুর দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক কমরেড তুষার জানা, নারায়ণগড় -২ লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড শ্যামাপদ জানা প্রমুখ।

পশ্চিম মেদিনীপুর

পুরুলিয়া ঃ ২০ মার্চ এস ইউ সি আই (সি) পুরুলিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা কমিটির উদ্যোগে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড পঞ্চানন প্রধান। সভা পরিচালনা করেন পুরুলিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড কমরেড অসিত ভট্টাচার্য।

পুরুলিয়া

কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার ঃ কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের এসইউসিআই(সি) প্রার্থী যথাক্রমে কমরেড দিলীপ চন্দ্র বর্মন ও কমরেড চন্দন ওরাওঁয়ের সমর্থনে ২১ মার্চ কোচবিহার শহরের সুকান্ত মঞ্চে দুই লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় কর্মীদের নিয়ে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপস্থিত কর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু।

কোচবিহার

রাজ্যে রাজ্যে মনোনয়ন জমা দলের প্রার্থীদের

কোচবিহার-১ তফসিলি লোকসভা কেন্দ্রের এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থী কমরেড দিলীপ চন্দ্র বর্মন ২১ মার্চ জেলাশাসকের দপ্তরে মনোনয়নপত্র জমা দেন প্রার্থীকে সামনে রেখে রাজা রামমোহন রায় স্কোয়ার থেকে এক বিশাল মিছিল শহর পরিক্রমা করে। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক কমরেড শিশির সরকার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ওই দিনই পশ্চিম ত্রিপুরা কেন্দ্রে মনোনয়ন পত্র জমা দেন কমরেড অরুণ ভৌমিক (বাঁ দিকের ছবি)।

মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর মহারাষ্ট্রের নাগপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড নারায়ণ চৌধরী

মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের নদীয়া জেলা সম্মেলন

১০ মার্চ এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মোটর ভ্যানচালক ইউনিয়নের নদীয়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল রানাঘাটের পরিমল ভবনে। উপস্থিত ছিলেন ১৩০০ প্রতিনিধি। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ ভ্যানচালক আমির আলি। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন সুমন প্রামাণিক। প্রস্তাবের সমর্থনে ১৫ জন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। তাঁরা মোটরভ্যান চালকদের সরকারি স্বীকৃতি, সমস্ত রাস্তায় গাড়ি চালানোর অনুমতি এবং পুলিশি হয়রানি বন্ধ করার দাবিতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক কমরেড জয়ন্ত সাহা এবং রাজ্য সভাপতি ও এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস বক্তব্য রাখেন। কমরেড দীপক চৌধুরীকে সভাপতি ও সুমন প্রামাণিককে সম্পাদক করে ৫৫ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

নদিয়ায় মহকুমা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ

সন্দেশখালি সহ রাজ্যের সর্বত্র দুষ্কৃতীরাজ বন্ধ, আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করে সাধারণ মানুষের হয়রানি বন্ধ করা, বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার বসানোর সিদ্ধান্ত বাতিল, চার বছরের ডিগ্রি কোর্স বাতিল, অবিলম্বে সমস্ত সরকারি শূন্য পদে নিয়োগ ও সমস্ত নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতিগ্রস্তদের শাস্তি, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি রোধ সহ কয়েক দফা দাবিতে ২০ মার্চ কল্যাণী (ছবি), রানাঘাট ও কৃষ্ণনগর মহকুমা শাসকের দপ্তরে এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখান সাধারণ মানুষ। পরে কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

কল্যাণীতে বিক্ষোভ দেখাতে গেলে মহকুমা শাসকের দপ্তরের গেট আটকে দেয় বিশাল পুলিশবাহিনী। শেষে বিক্ষোভকারীদের দাবি মেনে চারজনের একটি প্রতিনিধিদলকে ডেপুটেশন দিতে দেয় প্রশাসন। কৃষ্ণনগর ও রানাঘাট মহকুমাশাসকের দপ্তরেও দাবি সনদ পেশ করা হয়।

উত্তরাখণ্ডের গাড়ওয়াল লোকসভা কেন্দ্রে দলের প্রার্থী কমরেড রেশমা পানওয়ার শ্রীনগরে প্রচার করছেন

উত্তর কলকাতায় দেওয়াল লিখন

শিক্ষাকে পণ্য আর ছাত্রকে ক্রেতায় রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া চলছেই

শিক্ষা প্রসঙ্গে সাধারণ ভাবে একটা স্থূল ধারণার প্রচলন আছে। ধারণাটি হল, কোনও বিষয়ে জানাই হল শিক্ষা। অনুশীলন সেই প্রক্রিয়ারই অঙ্গ। যদিও ধারণাটির সীমাবদ্ধতা আছে। যা খুশি শেখাই কিন্তু শিক্ষা নয়। শেখার সাথে বৃহত্তর সমাজ ও তার প্রতি দায়বদ্ধতার প্রশ্নটিও যুক্ত। অর্থাৎ শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা যে জ্ঞান অর্জন করি, তার লক্ষ্য সমাজের মঙ্গল সাধন করা, আরও উন্নততর সভ্যতার অভিমুখে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাই শিক্ষার প্রতি সমাজও দায়বদ্ধ। দায়বদ্ধ বৃহত্তর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিনিধি হিসেবে একটা দেশের সরকার। এই ধারণা থেকেই গণতান্ত্রিক যুগের বিশ্বমনীষা শিক্ষার প্রতি দেশের সরকারকে যত্নবান হতে বলেছেন। শিক্ষার সব দায়িত্ব সরকারকে নেওয়ার জন্য দাবি জানিয়েছেন। আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, জ্যোতিবা ফুলে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মহান মনীষীরা শিক্ষার উন্নতির জন্য ইংরেজ সরকারের দায়িত্বকে স্মরণ করিয়েছেন বারবার। আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যেও জনশিক্ষার এই দাবি যুক্ত হয়ে ছিল।

এরপর দেশ স্বাধীন হয়েছে ৭৫ বছর। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু পরাধীন দেশে শিক্ষার যে দাবি সেদিন উঠেছিল তা আজও অপূরিত। সেইদিন শিক্ষা সম্পর্কে সমাজ মননে যে উচ্চ ধারণাটা তৈরি হয়েছিল, তাও প্রতিদিন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে চলেছে, যার পরিণতিতে দেশের সামগ্রিক শিক্ষা আজ আশঙ্কাজনক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

দেশে শিক্ষার হাল হকিকত

অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস অব এডুকেশন রিপোর্ট ২০২৩-এ দেশের স্কুল শিক্ষা সম্পর্কে যে তথ্য প্রকাশ করেছে, তা ভয়ঙ্কর! রিপোর্টে প্রকাশ, দেশের গ্রামীণ এলাকায় ১৪-১৮ বছর বয়স এমন ২৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাঠ্য বইয়ের থেকে মাতৃভাষায় লেখা বাক্য পড়তে পারছে না। ৫৪ শতাংশ ছাত্র তিন অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে পারছে না। এমনকি সাধারণ যোগ বিয়োগও করতে পারছে না অনেকেই। সারা দেশে যখন এই চিত্র, তখন পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও ভিন্ন নয়। মাতৃভাষায় লেখা পড়তে না পারার তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয়। এমনকি ইংরাজি বাক্য পড়তে না পারায় এই রাজ্য সব থেকে নিচে। রিপোর্টে আর একটি তথ্যও আশঙ্কাজনক। রিপোর্ট আরও বলছে, ১৪-১৮ বছর বয়সী ছাত্রছাত্রীদের একটা বড় অংশের কোনও স্বপ্ন নেই। যাদের আছে তারাও স্কুল শিক্ষক, পুলিশ আর ডাক্তার হওয়া ছাড়া অন্য কোনও স্বপ্ন দেখতে পারছে না।

এই অবস্থার দায় কার

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই অবস্থার দায় কার? সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার এই অধঃপতনের দায় সরকার কি আদৌ এড়িয়ে যেতে পারে! স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে শিক্ষা প্রসঙ্গে সরকারগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি কখনই যথাযথ ছিল না। প্রায় সমস্ত সরকারই ধারাবাহিক ভাবে কমিয়েছে শিক্ষার বাজেট। তবু তখনও আপেক্ষিক অর্থে শিক্ষা সম্পর্কে সরকারগুলো যতটুকু দায়িত্ব পালন করত সমাজতান্ত্রিক সমাজের পতনের পর পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের একমুখী ব্যবস্থায় তাকেও তারা অস্বীকার করল। এল বিশ্বায়নের ধারণা। পুঁজিবাদের বাজার সঙ্কটের যুগে গ্লোবাল ভিলেজের নামে গোটা বিশ্বকে পরিণত করা হল পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের বাজারে। রমরমিয়ে চলল বেসরকারিকরণ। এল বাজার অর্থনীতি। ভারতবর্ষের বাজারও খুলে দেওয়া হল বিশ্ব-পুঁজির অনুপ্রবেশের জন্য। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ সহ সমস্ত পরিষেবা ক্ষেত্রকে পরিণত করা হল বাজারের পণ্যে। ক্রমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকার তার দায়িত্বকে অস্বীকার করে বেসরকারিকরণের পথকে প্রশস্ত করল। এই ব্যাপারে প্রায় সব দল একই ভূমিকা পালন করেছে। সেদিনের কংগ্রেস সিপিএম বা আজকের বিজেপি তৃণমূল সহ অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলো সবাই এই পথেই হেঁটেছে। তাই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেশে ও রাজ্যে আলাদা আলাদা দলের সরকার থাকলেও শিক্ষা সমস্যার সমাধান তো হয়ইনি, শিক্ষার পরিবেশের আরও ক্ষতি করা হয়েছে। সরকারগুলোর পক্ষ থেকে নানা সময়ে নানা স্লোগানের আড়ালে শিক্ষাঙ্গন থেকে দেশের গরিব মানুষের সন্তানদের বিতাড়িত করা হয়েছে।

শিক্ষার প্রশ্নে কংগ্রেস সিপিএম তৃণমূল বিজেপি একই ভূমিকায়

কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারি ক্ষমতায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব থেকে বেশি সময় রাজত্ব করেছে যারা সেই কংগ্রেস বিজেপি সিপিএম তৃণমূল তাদের সরকারি ক্ষমতা দিয়ে জনশিক্ষা প্রসারে বা শিক্ষা প্রসঙ্গে সমাজ মননে একটা উঁচু ধারণা গড়ে তোলার বিষয়ে যথাযথ ভূমিকা কখনই পালন করেনি। একদিকে শিক্ষার জন্য বাজেটে বরাদ্দ কমিয়ে সরকারি শিক্ষা পরিকাঠামোকে ধারাবাহিক ভাবে নষ্ট করা হয়েছে। কমেছে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ, সিপিএম সরকারের জমানা থেকেই রাজ্যে পার্শ্বশিক্ষক, প্যারা টিচার পার্টটাইম প্রফেসার নিয়োগের মধ্য দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যপক অস্থায়ী নিয়োগ চালু করা শুরু হয়েছে। যা আজও চলছে। বর্তমানে সারা দেশে দশ লক্ষের বেশি শিক্ষক পদ শূন্য অবস্থায় থাকলেও নিয়োগ নেই। নিয়োগ থাকলেও সেখানেও চলছে দুর্নীতি। এর বাইরে আরও পাঁচ লক্ষ পদে শিক্ষকতা করছেন পার্শ্ব শিক্ষকরা। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের চরম উদাসীনতায় ধুঁকছে। সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশের প্রায় অর্ধেক মাধ্যমিক স্কুলে নেই বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরি। উচ্চমাধ্যমিকে এই সংখ্যা আরও কম। গ্রাম ও মফসসলে পড়াশোনার জন্য উপযুক্ত স্কুল বাড়ি নেই এমন স্কুলের সংখ্যাও অনেক। এই যেখানে অবস্থা, সেখানে শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নত করে শিক্ষার পরিবেশ সুন্দর করার পরিবর্তে সরকারগুলো যে যেখানে ক্ষমতায় সেখানেই দান খয়রাতি করে হাততালি পেতে চেয়েছে। সিপিএম সরকার পরিকাঠামো ছাড়াই মিড-ডে-মিল চালু করার ফলে রাজ্যের স্কুলগুলো 'খিচুড়ি স্কুলে' পরিণত হয়েছিল। আজকের তৃণমূল সরকার স্কুলে সাইকেল, জুতো, ব্যাগ দিচ্ছে। কিন্তু শিক্ষার জন্য যে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো প্রয়োজন তা তারা তৈরি করছে না। শিক্ষক নিয়োগ প্রায় বন্ধ। বাকি পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত সরকারি বরাদ্দ নেই বললেই চলে। ফলে সরকারি স্কুলগুলো প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য ছাত্রদের থেকে ডেভেলপমেন্টফি-এর নামে ফি, ডোনেশন আদায় করে কোনও রকমে টিকে থাকার চেষ্টা করছে। ফলে পরিকাঠামোহীন সরকারি স্কুলেও প্রত্যেক বছর ফি বাড়ছে। আর পড়াশোনা? শিক্ষকহীন পরিকাঠামোহীন সরকারি স্কুলগুলোতেই সিপিএম আমলে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত বন্ধ করা হয়েছে ইংরেজি পড়ানো। তুলে দেওয়া হয়েছে পাশ-ফেল ব্যবস্থা। তৃণমূল আমলে যা ক্লাস এইট পর্যন্ত তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে মূল্যায়নহীন অবস্থায় পাশ করা ছাত্ররাই নাম লিখতে পারছে না। রিডিং পড়তে পারছে না। এই অবস্থায় পরিস্থিতির সাথে যুঝতে গিয়ে একদল ড্রপ আউট হয়ে যাচ্ছে। আর যাদের সামর্থ্য আছে, তারা চলে যাচ্ছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। রমরমিয়ে চলছে শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা। যেখানে শিক্ষা ব্যবসায়ী বিক্রেতা এবং ছাত্র ও তার পরিবার একজন ক্রেতা। প্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্কে পরিণত হচ্ছে এবং হয়ে চলেছে। যা সাম্প্রতিক কালে বাজার অর্থনীতির নিয়ম মেনেই পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনেও প্যাকেজ সিস্টেম, প্রতিষ্ঠানের আয় বাড়ানোয় ভূমিকা পালন করলে ফি-এর ক্ষেত্রে ডিসকাউন্টইত্যাদি চালু হয়েছে। যেটা হঠাৎ করে হয়নি। ধারাবাহিক প্রক্রিয়াতে শিক্ষার বেসরকারিকরণ হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষাঙ্গন বিরাট এক বাজারে পরিণত হয়েছে। এই বাজারের নানা ক্ষেত্রে পুঁজির বিনিয়োগ হচ্ছে মুনাফা অর্জনের জন্য। যে বাজারের ক্রেতা তারাই যাদের টাকার জোর আছে। গরিব মানুষ সেখানে ব্রাত্য।

সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার কফিনের শেষ পেরেক বিজেপির জাতীয় শিক্ষানীতি

কংগ্রেস নেতা রাজীব গান্ধীর শিক্ষানীতি ১৯৮৬, শিক্ষার বেসরকারিকরণের সিংহদুয়ার খুলে দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে দেশি বিদেশি পুঁজিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তারপর একের পর এক শিক্ষা কমিশন নানাঘোষনার মধ্যদিয়ে বেসরকারিকরণের এই কাজকেই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কংগ্রেস সরকার। এরপর ২০২০ সালে বিজেপি সরকারের শিক্ষানীতি সরকারি শিক্ষার যতটুকু অবশেষ ছিল তাকেও শেষ করে প্রাক প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত পুরো ব্যবস্থাটাকেই ধ্বংস করে শিক্ষার বেসরকারিকরণের পথকে আরও প্রশস্ত করে দিয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী সরকারি প্রাথমিক শিক্ষায় কোনও রকম বইয়ের ব্যবহার থাকবে না। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে বৃত্তিমুখী শিক্ষা চালু করা হবে। ধ্বংস করা হবে শিক্ষার মর্মবস্তু। তুলে দেওয়া হবে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক বোর্ড পরীক্ষা, চালু হবে সেমিস্টার। ডিগ্রি কোর্সকে তিন বছরের পরিবর্তে চার বছর করা হবে। তুলে দেওয়া হবে বহু সরকারি স্কুল। ইতিমধ্যে দেশের বহু রাজ্যের সরকারি স্কুল বন্ধ করে সেগুলিকে দেশি-বিদেশি মালিকদের ব্যবসার জন্য তুলে দেওয়া হচ্ছে। খোদ পশ্চিমবঙ্গেই তুলে দেওয়া হচ্ছে ৮২০৭টি সরকারি স্কুল। সরকারি তথ্য অনুযায়ী সারা দেশে এই সংখ্যা ১ লক্ষেরও বেশি। পাশাপাশি শিক্ষার গণতান্ত্রিক চেতনা বৈজ্ঞানিক মনন ধ্বংস করা হচ্ছে। আর এ সবই হচ্ছে সরকারি স্কুলে। যেখানে সাধারণ বাড়ির ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে। ফলে গরিবের ঘরের শিক্ষাকে চিরতরে শেষ করতে চাইছে বিজেপি। আর তখন কি করছে বাকি দলগুলো? সিপিএম পরিচালিত কেরালা ইতিমধ্যেই বিজেপির এই অন্ধ তামসিক শিক্ষার মর্মবস্তু ধ্বংসকারী শিক্ষানীতিকে লাল ঝান্ড উড়িয়েই প্রণয়ন করা শুরু করেছে। বেসরকারিকরণের নীতির প্রশ্নে কংগ্রেসও বিরোধিতা করেনি। কারণ তারাই তো পথ প্রদর্শক। আর এ রাজ্যে তৃণমূল, মৌখিক বিরোধিতা করে রাজ্যের নিজস্ব শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে। রাজ্য শিক্ষানীতি ২০২৩। যা কেন্দ্রের শিক্ষানীতিরই কার্বন কপি।

এই অবস্থায় দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি মালিকদের ব্যবসার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। দেশি-বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ চলছে শিক্ষার সমস্ত ক্ষেত্রে। জেনারেল এডুকেশন, টেকনিক্যাল এডুকেশন, প্রফেশনাল এডুকেশন সমস্ত স্তরের শিক্ষাতেই আজ পুঁজির রাজত্ব চলছে। লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে শিক্ষা বিক্রি হচ্ছে। একদিকে যখন বাড়ছে জীবন জীবিকার সঙ্কট তখন সেই সঙ্কটকেও পণ্যে পরিণত করে বিজ্ঞাপিত করে নতুন বাজার তৈরি করা হচ্ছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্যও নানা প্রতিষ্ঠানে লক্ষাধিক টাকার কোর্স বিক্রি করা হচ্ছে। চালু হয়েছে টিউটোপিয়া বাইজুসের মতো অনলাইন টিউটোরিয়াল। যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা বিনিয়োগে ফিল্মস্টারদের বিজ্ঞাপনের মুখ করে, বাজার সৃষ্টি করা হচ্ছে। আর তা চলছে সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে। টাকা, বৈভব, বিজ্ঞাপন, ঝাঁ চকচকে জৌলুস, র‍্যান্ডম প্রতিযোগিতা— এর উপযুক্ত চিন্তা জগতকেও প্রোমোট করছে পুঁজির মালিকরা। আর এ সব মিলিয়ে আজকের শিক্ষা আপাদমস্তক কর্পোরেট পুঁজি ও ব্যবসায়িক লক্ষ্যে পরিচালিত। সাধারণ বাড়ির ছাত্রছাত্রীরা সে বাজারে ব্রাত্য।

চালু হয়েছে টিউটোপিয়া, বাইজুসের মতো অনলাইন টিউটোরিয়াল। যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা বিনিয়োগে ফিল্মস্টারদের বিজ্ঞাপনের মুখ করে বাজার সৃষ্টি করা হচ্ছে। আর তা চলছে সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে।

... সব মিলিয়ে আজকের শিক্ষা আপাদমস্তক কর্পোরেট পুঁজি ও ব্যবসায়িক লক্ষ্যে পরিচালিত। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা সে বাজারে ব্রাত্য।

পাঠকের মতামত

বন্ডের অঙ্ক

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে একচেটিয়া বৃহৎ ব্যবসায়িক গোষ্ঠীদের পছন্দসই ও তাদের স্বার্থরক্ষার কাজে যোগ্য রাজনৈতিক দলের গদি রক্ষার গ্যারান্টি হল বহু বিতর্কিত ইলেক্টোরাল বন্ড।

দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশকে হেলায় উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। বলেছিল— 'আমরা কাগজ দেখাবো না'। যদিও শেষরক্ষা হয়নি।

পাঁচ বছর ধরে একটা রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় বসিয়ে রাখার জন্য যে পরিমাণ পুঁজি ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে ওই দলের ফান্ডে কর্পোরেট মালিকরা ঢেলেছেন, সেই পরিমাণ পুঁজি ব্যাঙ্কে বা শিল্পে ওই পাঁচ বছর খাটলে যে লাভ হত তার ক্ষতিপূরণ কে দেবে? বিভিন্ন সরকারি ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রতিষ্ঠান থেকে এই ক্ষতিপূরণ আদায়ের সহজ ও পরিপুষ্ট ব্যাবস্থাপনা করে দেওয়াই হল ইলেক্টোরাল বন্ডের স্বাভাবিক শর্ত। যার ফলশ্রুতিতে মোদি সরকার গত দশ বছর ধরে একে একে সমস্ত সরকারি পরিষেবাগুলিকে (রেল, বিএসএনএল পরিষেবা, বিমানবন্দর ও জাহাজ বন্দর পরিষেবা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকারি বাজেট কমিয়ে বেসরকারি বিনিয়োগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি ইত্যাদি) আদানি ও আম্বানিদের হাতে তুলে দিয়ে তাঁর দেওয়া শর্ত পূরণ করে চলেছেন।

ইলেক্টোরাল বন্ডের এই সহজ অঙ্কটা বুঝতে পারলে, নির্বাচনী বন্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে মানুষ বুঝতে পারবেন।

ডাঃ দীপক গিরি
পশ্চিম মেদিনীপুর

মানবসম্পদ উন্নয়নে পিছোচ্ছে মোদির ভারত

একের পাতার পর

তিনটি দেশের ভাণ্ডারে। ২০২১-এর তথ্য বলছে, ৯০ শতাংশেরও বেশি দেশের জিডিপিকে (মোট উৎপাদিত পণ্যের মূল্য) ছাপিয়ে গেছে মাত্র তিনটি বহুজাতিক প্রযুক্তি কোম্পানির পুঁজি। সমীক্ষার আওতায় আসা অর্ধেকেরও বেশি মানুষ মনে করছেন, নিজেদের জীবনের ভাল-মন্দের ওপর তাঁদের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই, দেশের সরকারের নীতি প্রণয়নের সাথেও তাঁদের কোনও সম্পর্ক নেই।

একদিন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসানে জনগণের জন্য-জনগণের দ্বারা পরিচালিত-জনগণের গণতন্ত্রের স্লোগান দিয়ে এই বুর্জোয়া ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটেছিল। বিশ্বজুড়ে মানুষের দুর্দশার ছবি প্রমাণ করে, বাইরের খোলসে 'গণতন্ত্র' শব্দটা টিকে থাকলেও, মুনাফাসর্বস্ব পুঁজিবাদ আজ দেশে দেশে সাধারণ মানুষকে শোষণ করার ক্ষেত্রে স্বৈরতন্ত্রই চালাচ্ছে।

বন্ড কেলেঙ্কারি

বিজেপিকে টাকা দিলেই রেহাই দুর্নীতির অভিযোগ থেকে!

দিল্লিতে আবগারি দুর্নীতির অভিযোগে ইডির হাতে এখন বন্দি মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সেই মামলায় একদা প্রধান অভিযুক্ত ছিলেন, অরবিন্দ ফার্মা নামে ওষুধ কোম্পানির মালিক পি শরৎচন্দ্র রেড্ডি। ২০২২-এর ১০ নভেম্বর রেড্ডি সাহেব গ্রেফতার হওয়ার পাঁচ দিন পরেই তাঁর কোম্পানি ৫ কোটি টাকার ইলেক্টোরাল বন্ড কিনে বিজেপি তহবিলে জমা করে দেয়। ২০২৩-এর মে মাসে কোমর ব্যথার অজুহাতে তিনি হাইকোর্টে জামিন চাইলে ইডি আপত্তি করেনি। ইডি তাদের হেফাজতে থাকা কারও জামিনে সায় দিয়েছে এটা আইন-আদালত সম্পর্কে খোঁজ রাখা কেউ মনে করতে পারছেন না। এমনকি অতি সম্প্রতি বিনা বিচারে দিনের পর দিন কাউকে আটকে রাখার প্রবণতার জন্য সুপ্রিম কোর্ট ইডি-র সমালোচনা করেছে। বন্ড তথ্য প্রকাশ্যে আসার পর দেখা গেছে, অরবিন্দ ফার্মা মোট ৫২ কোটি টাকার বন্ড কিনেছে, তার ৩৪.৫ কোটি টাকা গেছে বিজেপির কাছে। রেড্ডির অন্য সংস্থা ১০ কোটি টাকা বিজেপিকে দিয়েছে। এই রেড্ডি এখন সরকার পক্ষের রাজসাক্ষী, তার বিবৃতির ভিত্তিতেই নাকি গ্রেফতার আপের একাধিক নেতা সহ মুখ্যমন্ত্রী!
(আনন্দবাজার পত্রিকা ২৩.০৩.২৪)

২০১৪-তে কংগ্রেসের নেতা তথা সনিয়া গান্ধীর জামাই রবার্ট বঢরা, হরিয়ানায় কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং হুডা এবং ডিএলএফ কোম্পানির বিরুদ্ধে জমি দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ব্যাপক প্রচার করেছিল বিজেপি। ২০১৯-এ ডিএলএফ অফিসে তল্লাশি করে সিবিআই। নির্বাচনী বন্ডের তথ্য প্রকাশ পেতে দেখা যাচ্ছে এর পরেই ডিএলএফ গোষ্ঠীর তিনটি কোম্পানি মিলে ১৭০ কোটি টাকার নির্বাচনী বন্ড কিনে বিজেপিকে দেয়। তার পরেই হরিয়ানার বিজেপি সরকার পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে জানায়, এই জমি লেনদেনে কোনও দুর্নীতি হয়নি। অবশ্য বঢরা সমাজমাধ্যমে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলার অভিযোগ তোলার পর বিজেপি সরকার আবার জানায় এখনও কাউকেই তারা ক্লিনচিট দেয়নি। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪.০৩.২৪)

টাকা ঢাললেই সাত খুন মাফ! এটাই নীতি শাসক বিজেপি-র

শাসক দলের তহবিলে বিপুল টাকা ঢেলে একের পর এক কোম্পানি কী ভাবে নানা অন্যায় ও বেআইনি সুযোগ-সুবিধা লুটেছে, নির্বাচনী বন্ড নিয়ে দেশজোড়া তোলপাড়ে তা প্রকাশ্যে এসে গেছে। নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে সম্প্রতি উঠে এসেছে এরকম আরও একটি কোম্পানির নাম— নবযুগ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড।

অনেকেরই মনে আছে কয়েক মাস আগে উত্তরাখণ্ডের সিল্কিয়ারায় সুড়ঙ্গ ধসে কী ভাবে বিপন্ন হয়েছিল ৪১ জন শ্রমিকের প্রাণ। ১৬ দিন পরে একদল র‍্যাটহোল মাইনার শ্রমিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁদের উদ্ধার করেছিলেন। প্রকাশ্যে এসে গিয়েছিল, সুড়ঙ্গ তৈরি করতে গিয়ে ওই নবযুগ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি নিরাপত্তার বহু নিয়ম অমান্য করেছিল যার জেরে এই ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি। সংস্থাটির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জোরালো দাবি ওঠা সত্ত্বেও কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কিন্তু সেই সময় নড়ে বসেনি।

এখন জানা যাচ্ছে, ওই নির্মাণ সংস্থা ২০১৯ থেকে ২০২২-এর মধ্যে একে একে ৫৫ কোটি টাকার নির্বাচনী বন্ড কেনে এবং পুরো টাকাটাই ঢালে বিজেপির তহবিলে। সুড়ঙ্গ তৈরির বরাত পাওয়া এবং নিরাপত্তার নিয়ম না মেনে এতগুলি মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার এমন ভয়ঙ্কর অপরাধের পরেও সংস্থাটির বিরুদ্ধে বিজেপি সরকারের টুঁ শব্দটি না করার পিছনে যে কাজ করেছে ওই বিপুল অনুদান, বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় কি?

কর্পোরেটের চাঁদাতেও এগিয়ে বিজেপি, সিপিএমও বাদ যায়নি

অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর)-এর হিসাব অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে কর্পোরেট কোম্পানিগুলো যত চাঁদা দিয়েছে তার ৯০ শতাংশ গেছে বিজেপির তহবিলে। তারা পেয়েছে ৬৮০.৪৯৫ কোটি টাকা। বাকি সব জাতীয় দল মিলে পেয়েছে ৭০ কোটির কিছু বেশি। কংগ্রেস পেয়েছে ৫৫.৬২৫ কোটি টাকা, আপ ১১ কোটি টাকা, সিপিএম ২ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। সিপিএম নির্বাচনী বন্ড থেকে কোনও টাকা না নিলেও ধারাবহিকভাবে কর্পোরেট কোম্পানির থেকে টাকা নিয়েছে। ২০১৪-২০১৮ পর্যন্ত তারা কর্পোরেট থেকে পেয়েছে ৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২২-এ নিয়েছে ৬.৯১৫ কোটি টাকা (অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের রিপোর্ট এবং বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ১০.০৪.২২)। ২০২১-২২ থেকে কংগ্রেসের সামগ্রিক এবং কর্পোরেটদের থেকে পাওয়া অনুদান ১৬ শতাংশের বেশি কমেছে, বিজেপির বেড়েছে ১৭.২ শতাংশ।

জাতীয় দলগুলির মধ্যে এই সময় কর্পোরেট কোম্পানির টাকা এবং অন্য বড় অনুদান পাওয়ায় সিপিএমের হার সবচেয়ে বেশি কমেছে (৩৯.৫৬ শতাংশ)। অবশ্য তারপরেও তারা ২০২২-২৩-এ ৬ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার বড় অনুদান পেয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, যে দলের সংসদীয় ক্ষমতা বেশি, বৃহৎ ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিরা তাদের ঢেলে টাকা দিয়েছে, বাকিদের ভাগ কমেছে। তবে তারা নিজেদের কোনও সেবাদাস দলকেই একেবারে বঞ্চিত করেনি। এক্ষেত্রে ঘোষিত বুর্জোয়া দলগুলি নির্বাচনী বন্ড থেকে গোপনে টাকা নিয়েছে। বামপন্থী বলে পরিচিত সিপিএম নির্বাচনী বন্ডের টাকা না নিয়েও কর্পোরেট কোম্পানির অশীর্বাদ থেকে বাদ যায়নি। (এডিআর রিপোর্ট '২২-'২৩)

নমাজরতদের উপর পুলিশি বর্বরতার নিন্দা

উত্তর দিল্লির ইন্দোরলোক এলাকায় ৮ মার্চ নমাজ পড়ছিলেন কিছু মানুষ। দিল্লি পুলিশের এক ইন্সপেক্টর হঠাৎ তাঁদের লাথি মারেন। মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর পক্ষ থেকে ১১ মার্চ এক বিবৃতিতে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয়। সংগঠন বলেছে, রাস্তা আটকে যে কোনও ধর্মাচরণ যা স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে, সে নমাজ হোক বা দুর্গাপুজো-কালীপুজো, তা প্রতিকার করার সুনির্দিষ্ট আইনি ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এ জন্য কোনও পুলিশ অফিসার কাউকে লাথি মারতে পারেন না। সিপিডিআরএস দোষী পুলিশ অফিসারের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

এ কোন 'সান্তা ক্লজ', ড্রপ বক্সে কোটি কোটি টাকার বন্ড ফেলে যায়!

শিশু ভোলানো গল্প অনুসারে বড়দিনের আগে শিশুদের মাথার কাছে গোপনে উপহার রেখে যায় সান্তা ক্লজ। এখন জানা যাচ্ছে ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসের ড্রপ বক্সে এমনই কেউ নাকি গোপনে কোটি কোটি টাকার নির্বাচনী বন্ড ফেলে দিয়ে গেছে! কেউ আবার নাকি চুপি চুপি বার্তাবহ দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। তৃণমূলের দেড় হাজার কোটি টাকার বেশি নির্বাচনী বন্ড প্রাপ্তির ব্যাখ্যায় এমন রহস্য কাহিনীই শুনিয়েছেন সে দলের নেতারা ।

একই রকম দাবি, সম্প্রতি বিজেপির কোলে ফিরে আসা নীতীশ কুমারের দলের। এভাবেই নাকি ১০ কোটি টাকা তাঁদের কেউ পাঠিয়ে দিয়েছে, তাঁরা জানতেও পারেননি! এমনই অজানা সান্তা ক্লজের আশীর্বাদের কাহিনী শুনিয়েছেন, এনসিপি, তেলুগু দেশম, সমাজবাদী পার্টি ইত্যাদির নেতারা। জনগণ গালে হাত দিয়ে ভাবছে— আহা রে! আমাদের অনাহারের দিনগুলোতেও যদি এমন করে দু'মুঠো চাল হাঁড়িতে রেখে যেত ওই সান্তা!

নেতা-মন্ত্রী কেনার হিড়িকেই স্পষ্ট
বিজেপি নেতারা আসলে স্বস্তিতে নেই

বিজেপিতে আসলে বিজেপি কতজন? ধাঁধার মতো মনে হচ্ছে কি? হলফ করে বলা যায়, নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে অমিত শাহ, জেপি নড্ডারাও চট করে এই ধাঁধার উত্তর দিতে পারবেন না। আঙুলের কর গুনে সংখ্যা বলতে তাঁদেরও যথেষ্ট সময় লাগবে। মহারাষ্ট্রের রাজ্যসভা সাংসদ সঞ্জয় রাউতের হিসাবে বিজেপির ৩০৩-জন লোকসভা সাংসদের মাত্র ১০১-জন প্রথম থেকে বিজেপি। ২০২ জনের বেশি হয় অন্য দলের হয়ে ভোটে জিতে পরে বিজেপি হয়েছেন, না হলে ভোটের ঠিক আগে সুবিধা বুঝে শাসকদলে এসেছেন।

তা হলে এবারের ভোটে নরেন্দ্র মোদির '৪০০ পার' স্লোগান! না হলেও অন্তত অমিত শাহের বলা ৩৭০ সাংসদের ভাণ্ডার পূর্ণ হবে কাদের দিয়ে? বিজেপি যাদের দাঁড় করাবে কিংবা ভোটের পর কিনবে বলে ছক কষছে তাদের বেশিরভাগই তো আসলে বিজেপি নয়! বাস্তবটা হল মোদি সাহেব নিজেই তাঁর সরকার তথা দলের দুর্বলতা সবচেয়ে ভাল জানেন। তাঁর বাহিনীর রথী-মহারথীদের অনেকেরই যে (একটু চক্ষুলজ্জার রেশ যদি থেকে গিয়ে থাকে কারও) ভোটারদের সামনে দাঁড়াতে পা কাঁপবে, তা তাঁর জানা।

তাঁরা দশ দশটা বছর কেন্দ্রের গদিতে। মোদি সাহেবের দল এখন বেশ কয়েকটি রাজ্যেও সরকার চালাচ্ছে। তাই এখন আর বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, শ্রমিকের কাজের উপযুক্ত বেতন না মেলা, কৃষকের ফসলের দাম না মেলার দায় কংগ্রেসের উপর চাপিয়ে নিজেদের জামা পরিষ্কার রাখার উপায় নেই। মোদি সাহেব জানেন, তাঁর 'বিকশিত ভারত' স্লোগানের জোরে সঙ্কটের চিঁড়ে ভিজবার নয়। তাঁর জমানায় 'বিকাশের' চোটে মুষ্টিমেয় ধনীদের কেনার উপযুক্ত গাড়ি, বাড়ি, বিলাস দ্রব্যের চাহিদা বেড়েছে। কমেছে কোটি কোটি সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা।

এই পরিস্থিতিতে অন্য দলের থেকে এমপি-এমএলএ কেনা ছাড়া তাঁর আর অন্য উপায় নেই। অবশ্য সম্প্রতি চণ্ডীগড়ের মেয়র নির্বাচনের সময় রিটার্নিং অফিসারের সাহায্যে কারচুপিতে তাঁরা যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন সেটাও একটা রাস্তা হতে পারে। মোদি সাহেবরা ভালই জানেন, এ তাঁদের শক্তির লক্ষণ নয়, বরং চরম দুর্বলতার প্রকাশ। আত্মবিশ্বাস থাকলে কংগ্রেস, তৃণমূল, এনসিপির নেতাদের কিনে দলের ভাণ্ডার ভরাতে বিজেপিকে ঝাঁপাতে হত না।

এখন বিজেপির একাধিক মুখ্যমন্ত্রী, লোকসভা-রাজ্যসভার সাংসদ আসলে কংগ্রেসের পুরনো মুখ। অবস্থা দেখে রাজনৈতিক মহলে এমন কথাও উঠেছে— বিজেপির 'কংগ্রেস-মুক্ত ভারত' স্লোগান কি অবশেষে 'কংগ্রেস-অধ্যুষিত' বিজেপিতে পৌঁছেছে? সদ্য শেষ হওয়া রাজ্যসভার ভোটে মহারাষ্ট্র থেকে বিজেপির টিকিটে জিতেছেন কংগ্রেস সরকারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক চহ্বন। বিজেপিরই প্রকাশিত শ্বেতপত্রে স্থান পাওয়া 'আদর্শ আবাসন কেলেঙ্কারি'-র প্রধান অভিযুক্ত তিনি। অবশ্য মহারাষ্ট্রে বিজেপির জোট সরকারটাই চলছে দল-ভাঙানোর খেলার জোরে। শিবসেনা এবং শারদ পাওয়ারের এনসিপিতে ভাঙনের খেলায় কত শত কোটি টাকা খরচ হয়েছে, কোন কোন দুর্নীতি চাপা দিয়ে রাখার গোপন বোঝাপড়া হয়েছে তা বিজেপি নেতাদের বলবার সাহস আছে? সম্প্রতি হিমাচল প্রদেশে একটা রাজ্যসভা আসন জেতার জন্য বিজেপি যেভাবে কংগ্রেসের বিধায়কদের টোপ দিয়েছে তাও মানুষের স্মৃতিতে টাটকা। বিজেপি সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনে জিতেছে। কিন্তু তার কারিগর কংগ্রেস-ভাঙা নেতারা। পাঁচ বছর আগে মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি হেরে গেলেও কিছুদিনের মধ্যে কংগ্রেসের ২২ জন এমএলএ-কে কিনে নিয়ে সরকার দখল করে নিয়েছিল। গোয়াতে ২০২২-এ একইভাবে ভোটের পর কংগ্রেসের জেতা এমএলএদের ভাঙিয়ে সরকার গড়েছে বিজেপি। কর্ণাটক, উত্তরাখণ্ড, অরুণাচলে একই রকম কাজ করেছে বিজেপি। আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ২০১৫-র আগস্ট পর্যন্ত ছিলেন কংগ্রেসের নেতা। তাঁর বিরুদ্ধে চিটফান্ড সহ বহু দুর্নীতির অভিযোগ আগে তুলত বিজেপি, এখন তিনি শুদ্ধ! মণিপুরের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বীরেন্দ্র সিং, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা দুজনেই কংগ্রেসের পুরনো পরিচিত নেতা। মণিপুরে ৮ জন কংগ্রেস এমএলএ নিজের দল সরকারিভাবে না ছেড়েও বিজেপির সরকারকে সমর্থন করেছেন।

অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অভিজ্ঞতাও এক। এ রাজ্যের বিজেপির সর্বাধিক প্রচারিত মুখ তথা বিধানসভায় বিজেপির পক্ষে বিরোধী দলনেতা মাত্র কয়েক বছর আগেই ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান মুখ। নারদ স্টিং অপারেশনে তাঁর টাকা নেওয়ার ছবি বিজেপি একসময় খুব ছড়িয়েছিল। কোচবিহারের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক তৃণমূলের নেতা থাকার সময় বিজেপি তাঁর বিরুদ্ধে বহু অনৈতিক কাজের অভিযোগ তুলত। এখন তিনিই বিজেপি নেতা। দক্ষিণ দিনাজপুরের এমএলএ সৌমেন রায় বিজেপির হয়ে জিতে তৃণমূলে চলে গিয়েছিলেন, এখন জানা গেল তিনি হঠাৎ আবার বিজেপিতে ফিরেছেন। ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিংয়ের দলবদলের তালিকা মনে রাখাও বেশ দুরূহ। তিনি তৃণমূল থেকে বিজেপিতে গিয়েছিলেন। মাঝে আবার তিনি এসেছিলেন তৃণমূলে, কাগজে কলমে যদিও তিনি বিজেপিরই সাংসদ ছিলেন। তিনি আবার নাকি চলে গেছেন বিজেপিতে।

পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য দলবদলের খেলায় কোন পক্ষ জিতছে তা বলা মুশকিল। তবে এ ব্যাপারে কারও যে চক্ষুলজ্জারও বালাই নেই তা স্পষ্ট। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে দেখা গিয়েছিল সারদা-নারদা কেলেঙ্কারির দাগ সহ একাধিক তৃণমূল নেতা বিজেপিতে ঢুকছেন, তাঁরা নাকি তখন শ্বাস নিতে পারছিলেন না! আবার ২০২১-এ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটের পরে হাওয়া বুঝে তাঁরা তৃণমূলেই ফিরেছেন। তাঁদের অনেকেই সংবাদমাধ্যমের সামনে দল বদল করলেও সরকারিভাবে দলত্যাগ করেননি। কারণ দলত্যাগ বিরোধী আইনের কোপে নিজেদের এমএলএ বা এমপি-র গদিটা চলে গেলে সরকারি বেতন ও সুবিধা হাতছাড়া হবে। এই তালিকায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতার পরিবারের দু'জন সাংসদও আছেন। যাঁরা নাকি তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইতে একমাত্র বিজেপিকেই চ্যাম্পিয়ন হিসাবে দেখতে পাচ্ছেন, তাঁরা এ ঘটনাগুলি জানেন কি?

অবশ্য কোনও ভোটসর্বস্ব দলেরই যে নীতি আদর্শ বলে কিছু নেই তা এ ঘটনায় স্পষ্ট। কংগ্রেস সহ বিরোধীরা যাদের নেতা বানিয়েছে তারাও উচ্চস্তরের সুযোগসন্ধানী অথবা দুর্নীতিবাজ। না হলে বিজেপি তাদের কিনতে পারত কি? কারণ ভোটে জিতে ক্ষমতা ভোগ করা ছাড়া অন্য কোনও নীতির চর্চা এরা কেউ করে না। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস-সিপিএম জোটের হয়ে জিতেই বাইরন বিশ্বাসের তৃণমূলে ঢোকার ঘটনা মানুষ ভোলেনি। সিপিএমও কি বামপন্থা ও আদর্শের ভিত্তিতে রাজনীতি করেছে? করলে, তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর তাদের ফ্রন্টের শরিক দলগুলির ২৮ জন এমপি-এমএলএ এমনকি মন্ত্রী তৃণমূল কিংবা বিজেপিতে ঢুকেছেন, তার ১৯ জনই সিপিএম-এর টিকিটে জিতেছিলেন কী করে?

১৯৯৬-তে বিজেপি নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ী সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, সরকারে থাকতে হলে যদি কোনও দল ভাঙাতে হয়, তেমন জোটকে ছোঁয়া দূরে থাক আমরা দূর থেকে চিমটে দিয়েও স্পর্শ করব না। সে সময় কংগ্রেস ছিল শক্তিশালী, তাই আয়ারাম-গয়ারামের দল সেখানেই আশ্রয় নিত বেশি। এখন বিজেপির টাকা এবং অন্য জোর বেশি তাই সুযোগসন্ধানী নেতাদের ভিড় সেখানেই বেশি। বিজেপির রাজনৈতিক গুরু আরএসএসের ছাঁচে ঢালা যান্ত্রিক শৃঙ্খলার বহর দেখিয়ে যাঁরা একসময় বিজেপিকে 'অন্যরকম দল' বলে প্রচার করতেন, বিজেপির সেই নেতারা আজ আর মুখেও সে কথা আনেন না। একচেটিয়া ধনকুবের পুঁজিমালিকদের অনৈতিক সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে যে ক্ষমতা ও ধনসম্পত্তি এখন বিজেপি নেতারা ভোগ করছেন, তা রক্ষা করতে কোনও অনৈতিক পথ নিতে তাঁদের কোনও বাছবিচারের বালাই নেই। এরই ফল ভোগ করছে দেশের জনগণ।

এই হল আজকের সংসদীয় ব্যবস্থার চরিত্র। বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া দলগুলোর মোড়ক নানা রঙের, ভিতরের বস্তুটি একই রকমের পচা দুর্গন্ধময়।

গার্ডেনরিচে ক্ষতিপূরণ ও অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ

গার্ডেনরিচে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে পড়ে ১২ জনের মৃত্যু এবং বহু মানুষের আহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে ২৩ মার্চ বাঁধাবটতলা থেকে দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর প্রার্থী জুবের রব্বানির নেতৃত্বে শতাধিক কর্মী সমর্থকের এক বিক্ষোভ মিছিল কলকাতা পুরসভার ১৫ নম্বর বরো অফিসের সামনে পৌঁছে বিক্ষোভ দেখায়। জুবের রব্বানির নেতৃত্বে চারজনের প্রতিনিধি দল চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি দেয়। মিছিল চলাকালীন রাস্তার দু'ধারে বহু মানুষ আগ্রহের সঙ্গে দাঁড়িয়ে মিছিল দেখেন এবং এই প্রতিবাদকে সমর্থন জানান। প্রতিনিধি দল চেয়ারম্যানের কাছে দাবি করেন, অবিলম্বে সমস্ত বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করতে হবে এবং বাড়ি ভাঙার ঘটনায় মৃত, আহত এবং ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বেআইনি নির্মাণে যুক্ত দোষীদের সবাইকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। চেয়ারম্যান অবৈধ নির্মাণ বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেন।

তিনি পুরপ্রশাসনের গাফিলতির কথাও মেনে নেন। প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে তাঁকে জানানো হয় বেআইনি নির্মাণ বন্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং অপরাধীদের গ্রেফতার ও শাস্তির ব্যাপারে প্রশাসন সঠিক ব্যবস্থা না নিলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

শ্রমমন্ত্রীকে স্মারকলিপি এআইইউটিইউসি-র

বিদ্যুৎ শিল্পের ঠিকা শ্রমিকরা প্রশিক্ষিত ও দক্ষ হলেও সরকার তাদের অদক্ষ নির্মাণ শ্রমিকের সমান মজুরি দেয়। এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি লিমিটেড কন্ট্রাক্টরস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন হাইকোর্টে আবেদন করে। ২০২১-এর ২৯ জুলাই হাইকোর্ট রায় দেয়, বিদ্যুৎ শিল্পের ঠিকা শ্রমিকদের জন্য আলাদা ক্যাটাগরি করে মজুরি নির্ধারণ করতে হবে।

প্রশিক্ষিত শ্রমিক হিসেবে স্বাভাবিক ভাবেই এই কর্মীদের মজুরি সাদারণ নির্মাণ-কর্মীদের থেকে বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু ২০২৪-এর ২১ ফেব্রুয়ারি রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে বিদ্যুৎ শিল্পের ঠিকা শ্রমিকদের মজুরি অদক্ষ নির্মাণ শ্রমিকদের থেকেও কম প্রস্তাব করা হয়েছে। যা অন্যায় ও শ্রম আইন বিরোধী।

এর প্রতিবাদে এআইইউটিইউসি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস ২২ মার্চ শ্রমমন্ত্রীর উদ্দেশে একটি স্মারকলিপি দেন। শ্রম দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব ডেপুটেশন গ্রহণ করেন এবং বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 76, No.: 32 Bengali Weekly March 29, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

২৩ মার্চ যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশ জুড়ে শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং স্মরণ

২৩ মার্চ শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং শহিদ দিবস সারা দেশের সঙ্গে এ রাজ্যেও স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, বাজার, স্টেশন, রাস্তার গুরুত্বপূর্ণ মোড় সহ নানা জায়গায় যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। সর্বত্রই ছাত্র, যুব, মহিলা সংগঠন এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএসের উদ্যোগে অয়োজিত অনুষ্ঠানে বহু সাধারণ মানুষ উৎসাহের সাথে বীর বিপ্লবীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। শহিদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, ব্যাজ পরিধান, দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও তাঁর জীবন সংগ্রাম চর্চার মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হয়।

সরশুনা, কলকাতা

নদীয়া, কৃষ্ণনগর

কলকাতার সিঁথিতে ভগৎ সিং স্মরণে ছাত্ররা

পাঞ্জাব

গ্যালিফ স্ট্রিট, কলকাতা

হরিয়ানায় এস ইউ সি আই (সি)-র ভিওয়ানি জেলা কমিটির উদ্যোগে ২৩ মার্চ ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের শহিদ দিবস পালিত হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক, এআইইউটিইউসি-র জেলা সম্পাদক ও এআইকেকেএমএস-এর জেলা সম্পাদক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ভিওয়ানি, হরিয়ানা

আন্দোলনে ছাত্ররা

ওয়ার্কার্স কলেজ ঃ

ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরে ওয়ার্কার্স কলেজে স্নাতক স্তরের গণিত বিভাগে অবিলম্বে শিক্ষক নিয়োগ, কলেজ-ভবনের মেরামতি, ল্যাবরেটরিতে ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ, লাইব্রেরিতে প্রয়োজনীয় বইপত্রের সরবরাহ ইত্যাদি দাবিতে ওয়ার্কার্স কলেজ এআইডিএসও ইউনিটের পক্ষ থেকে ১৯ মার্চ বিক্ষোভ দেখানো হয়। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের কলেজ ইউনিট সভানেত্রী কমরেড পায়েল রানি মণ্ডল। কর্তৃপক্ষের কাছে দাবিপত্র পেশ করা হয়।

কোলহান বিশ্ববিদ্যালয় ঃ

২০১৭ থেকে জেনেরিক পেপারের পরীক্ষার দাবিতে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরে কোলহান বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা দপ্তরে এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয় ১৯ মার্চ।

মোদি সরকারের চরম ব্যর্থতা

সমীক্ষা বলছে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচিতে সরকারের ভূমিকা ভাল নয়।

- সরকারের প্রথম ব্যর্থতা বেকারত্ব মোকাবিলায়,
- সরকারে দ্বিতীয় ব্যর্থতা মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে,
- সরকারের তৃতীয় ব্যর্থতা কোভিড-১৯ মোকাবিলায়,
- সরকারের চতুর্থ ব্যর্থতা অর্থনৈতিক উন্নয়নে
- ৫৪ শতাংশ জনগণের অভিজ্ঞতা অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবিলায় সরকারের কাজ ভাল নয়,
- ৬১ শতাংশ জনগণ বলেছেন, দৈনন্দিন খরচ তারা চালিয়ে উঠতে পারছেন না,
- ৬৬ শতাংশ জনগণ বলেছেন, তাদের বেতন বাড়েনি, বহু ক্ষেত্রে কমানো হয়েছে।
- ৭০ শতাংশের বেশি মানুষের কাছে বেকারত্বই মারাত্মক সমস্যা।

(ইন্ডিয়া টু ডে ঃ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)

জামশেদপুরে ছাত্র-কিশোরদের বিপ্লবী শহিদ চন্দ্রশেখর আজাদ স্মরণ

ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরে এআইডিএসও এবং কমসোমলের উদ্যোগে স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বীর সৈনিক বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ শহিদ দিবস পালিত হয় ১৯ মার্চ। প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষক অজয় মেহতাব। শহিদ-প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর প্রধান বক্তা এআইডিএসও-র বিহার রাজ্য সম্পাদক বিজয় কুমার বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন এআইডিএসও এবং কমসোমলের রাজ্য নেতৃবৃন্দ সহ অন্যান্য নেতারা।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মুর্শিদাবাদের ২০টি ব্লকের তিন শতাধিক মহিলা ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে নারীদের অধিকার আন্দোলন শক্তিশালী করার বার্তা নিয়ে রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে বহরমপুর রোকেয়া ভবনে এক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীত আবৃত্তি, হস্তশিল্প প্রদর্শনী এবং নারী দিবসের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা হয়। সমিতির উদ্যোগে রাজ্যের ১২টি স্থানে নারী দিবস উদযাপিত হয়।

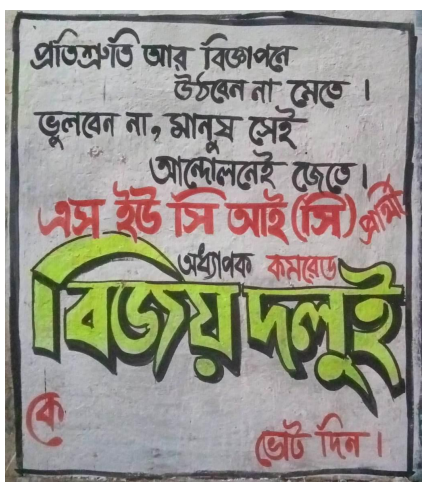

রাজ্য জুড়ে দলের প্রার্থীদের সমর্থনে ভরে উঠছে দেওয়াল

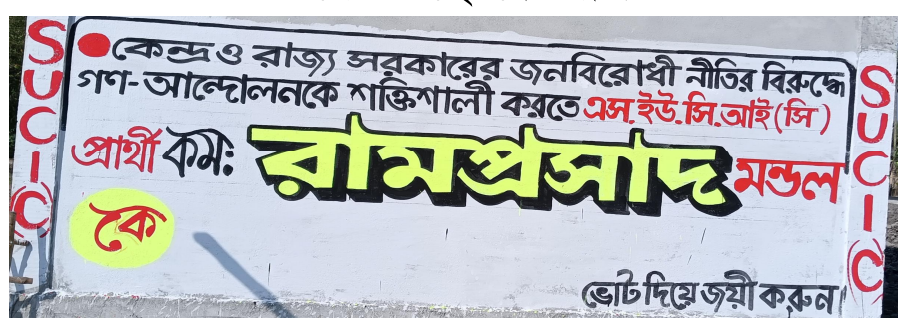

Editor : Amitava Chatterjee ■ Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. ■ 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com